পাঠ ৮.১ ঃ ল্যাবরেটরি ব্যবহার বিধি-পোশাক, নিরাপদ গ্লাস, মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস

১. **পোশাক :** ল্যাবরেটরিতে কখনোই ঢিলেঢালা জামাকাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের আগে ছাত্রছাত্রীদের সাদা অ্যাপ্রন (Apron) পরতে হবে। রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা যাতে জামাকাপড় নষ্ট না হয় সেজন্য অ্যাপ্রন পরা জরুরি। এছাড়াও অ্যাপ্রন পরিধানে ল্যাবরেটরিতে কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীরা মানসিক প্রস্তুতি লাভ করে। ছাত্রীরা প্রয়োজনে চুল বেঁধে মাথায় স্কার্ফ পরতে পারে।

২. **নিরাপদ গ্লাস :** চোখ মানুষের মূল্যবান সম্পদ। তাই চোখের সুরক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে নিরাপদ গ্লাস ব্যবহার করা উচিত। বিকারক বা রিয়াজেন্ট টেস্টটিউবে নিয়ে উত্তপ্ত করার সময় অনেক সময় তীব্র বেগে টেস্টটিউব থেকে বেরিয়ে আসে। উত্তপ্ত এবং তীব্র বেগে বেরিয়ে আসা রিয়াজেন্ট কোনোভাবে চোখে পড়লে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে চোখে গ্লাস ব্যবহার করলে এরূপ দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। গ্লাসের ফাঁক দিয়ে যেন গ্যাসীয় পদার্থ প্রবেশ করতে না পারে এজন্য গ্লাসের পার্শ্ব দিয়ে প্লাস্টিক লাগানো নিরাপত্তা গ্লাস ব্যবহার করা উত্তম।

৩. **মাস্ক :** ল্যাবরেটরিতে কোনো কোনো পরীক্ষায় মারাত্মক বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস নির্গত হয়। কোনোভাবে এসব গ্যাস নাসিকা দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করলে মাথাব্যথা, বমি হওয়া, শ্বাসকষ্ট, চোখে পানি আসা, চোখ লাল হওয়া এমনকি শিক্ষার্থী অনেক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। এসব দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য মাস্ক ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজন। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা কার্য পরিচালনার সময় সাধারণত H_2S, SO_2, NO_2, CO_2, NH_3, Cl_2 প্রভৃতি গ্যাস উৎপন্ন হয়। এ গ্যাসগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান।

মাস্ক ব্যবহার করলে এসব গ্যাসের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪. **হ্যান্ড গ্লাভস :** ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থগুলোর বেশির ভাগই হাতে, গায়ে বা চামড়ায় লাগলে ক্ষতিসাধন করে। এসব রাসায়নিক দ্রব্য খালি হাতে স্পর্শ করা ঠিক না। এজন্য ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করা দরকার। এছাড়া রিয়াজেন্ট বোতলের ছিপি খুলতে বা আটকানোর ক্ষেত্রে হাতে গ্লাভস পরে নিতে হবে। ভাঙা কাচের টুকরা, ব্যবহৃত ফিল্টার পেপার, ব্যুরেট, পিপেট, ইত্যাদি খালি হাতে না ধরে গ্লাভস পরা অবস্থায় ব্যবহার করা উত্তম।

গ্লাভসে কোনো ছিদ্র বা ছেঁড়া আছে কি না তা দেখে ব্যবহার করতে হবে। হাত থেকে গ্লাভস খোলার সময় হাতের কবজির দিক থেকে টেনে খুলতে হয়। গ্লাভস খোলার সময় বা ব্যবহারের সময় গ্লাভসে লেগে থাকা রাসায়নিক বস্তু যেন শরীরের ত্বকের সংস্পর্শে না আসে তা খেয়াল রাখতে হবে। ব্যবহার অনুপযোগী বা সংক্রমিত গ্লাভস নির্ধারিত বর্জ্য পাত্রে ফেলতে হবে। গ্লাভস খোলার পর ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

মৃদু ক্ষয়কারী পদার্থ, অস্বস্তিকর জ্বালা সৃষ্টিকারী পদার্থ, বৈদ্যুতিক শক্ থেকে রক্ষার জন্য PVC গ্লাভস বা ল্যাটেক্স গ্লাভস বা নিওপ্রিন গ্লাভস ব্যবহার করা হয়। শিখা পরীক্ষার মতো ছোটখাটো জ্বলন্ত বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় জিটেক্স গ্লাভস ব্যবহার করা ভালো। এক্ষেত্রে ক্যান্সার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের কারণে অ্যাসবেস্টসের গ্লাভস বর্তমানে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত হয় না।

এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জানা জরুরি–

(ক) বিপজ্জনক বস্তু (গাঢ় H_2SO_4, গাঢ় HNO_3, TNT, তীব্র ক্ষার), দাহ্য বস্তু (বেনজিন, পেট্রোল, স্পিরিট), বিষাক্ত গ্যাস (H_2S, HCN, Hg, NH_3, Cl_2) প্রভৃতি নিয়ে কাজ করার সময় শিক্ষকের পরামর্শ বা উপস্থিতি জরুরি।

(খ) আগুন দিয়ে তাপ দেওয়ার সময় উদ্বায়ী, দাহ্য বস্তুসমূহ সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এসব রাসায়নিক বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় আগুনের ব্যবহার বিপজ্জনক এবং দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

(গ) ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা, নেট চালানো, গল্প করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তা না হলে অমনোযোগিতা বা অসাবধানতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

(ঘ) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান ও ব্যবহার প্রত্যেকের জেনে রাখতে হবে।

(ঙ) ফাস্ট এইড বক্সের অবস্থান ও ব্যবহার জেনে রাখতে হবে।

(চ) শিক্ষকের পরামর্শ ও নির্দেশনা ব্যতিরেকে অযথা খেয়ালের বশে কোনো পরীক্ষা করা, বিক্রিয়া ঘটানো, লেবেল ছাড়া কোনো বিকারকের আনুমানিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

(ছ) সংরক্ষিত বিকারক বোতল প্রয়োজনীয় কাজ শেষে নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। বিকারক বোতল থেকে অতিরিক্ত বিকারক নিয়ে পরে অব্যবহৃত বিকারক পুনরায় বোতলে ঢেলে রাখা বা পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে।

সার-সংক্ষেপ

- **ল্যাবরেটরির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী :** ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে কতিপয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী পরিধান আবশ্যক। এসব ব্যক্তিগত সামগ্রী হলো– অ্যাপ্রোন, নিরাপদ গ্লাস, মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস।
- **ল্যাবরেটরি নিরাপত্তা :** রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কাজ করতে গেলে অ্যাপ্রোন, নিরাপদ চশমা এবং জুতা পরে কাজ করা, ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান না করা, কাজ শেষে ল্যাবরেটরি ত্যাগ করার পূর্বে বাতিনিভান, ফ্যান বন্ধ করা, গ্যাস সংযোগ বন্ধ করা, দরজা-জানালা বন্ধ করা ইত্যাদি।
- **অ্যাপ্রোন :** ল্যাবরেটরিতে কখনোই ঢিলেঢালা জামাকাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়। ল্যাবরেটরিতে প্রবেশের আগে ছাত্রছাত্রীদের সাদা অ্যাপ্রোন (Apron) পরতে হবে। রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা যাতে জামাকাপড় নষ্ট না হয় সেজন্য অ্যাপ্রন পরা জরুরি।
- **নিরাপদ গ্লাস :** ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় চোখে গ্লাস ব্যবহার করলে বিভিন্ন দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। গ্লাসের ফাঁক দিয়ে যেন গ্যাসীয় পদার্থ প্রবেশ করতে না পারে এজন্য গ্লাসের পার্শ্ব দিয়ে প্লাস্টিক লাগানো নিরাপত্তা গ্লাস ব্যবহার করা উত্তম।
- **হ্যান্ড গ্লাভস :** ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থগুলোর বেশির ভাগই হাতে, গায়ে বা চামড়ায় লাগলে ক্ষতিসাধন করে। এসব রাসায়নিক দ্রব্য খালি হাতে স্পর্শ করা উচিত নয়। এজন্য ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করা দরকার।
- **প্রাথমিক চিকিৎসা ও ফার্স্ট এইড ব· :** ল্যাবরেটরিতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ফার্স্ট এইড বক্স ব্যবহার করে এ ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।
- **ল্যাবরেটরির নিরাপত্তা সামগ্রী :** রসায়ন ল্যাবরেটরিতে সকলের ব্যবহারের জন্য কতিপয় নিরাপত্তা সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকে। এসব নিরাপত্তা সামগ্রীর মধ্যে ফিউম হুড, অগ্নি নির্বাপক, নিরাপত্তা জলাধার, চোখ ধৌতকরণ ট্যাপ, অগ্নি কম্বল, ফার্স্ট এইড বক্স, গ্যাস-বন্ধকরণ ভাল্ব, জরুরি টেলিফোন ব্যবস্থা অন্যতম।
- **আইক্যাপ :** শিক্ষার্থী বা অন্য কারো চোখে রাসায়নিক দ্রব্য লাগলে চোখ ভালোভাবে ধুয়ে ৪–৫ মিনিট পরপর পানি অপসারণ করে আইক্যাপ ব্যবহার করতে হয়।

পাঠ-৮.২ ঃ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ও গ্লাস সামগ্রী পরিষ্কার এবং ব্যবহারের নিরাপদ কৌশল

রসায়ন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাকার্য নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, ব্যুরেট, পিপেট, মাপন ফ্লাস্ক ইত্যাদি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পরীক্ষাকার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তবে ল্যাবরেটরির সকল যন্ত্রপাতি একই পদ্ধতিতে একই পরিষ্কারক দ্বারা পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। এজন্য ময়লা রাসায়নিক বস্তুর প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে দ্রাবক ও পরিষ্কারক নির্বাচন করতে হয়। যেমন– পানিতে দ্রবণীয় ময়লা সাধারণ পানি ও ডিজারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। পানিতে অদ্রবণীয় ময়লা বস্তু যেমন– গ্রিজ, তেল জাতীয় পদার্থ, অ্যাসিটোন বা ইথানল দিয়ে ধুয়ে পরে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাচের তৈরি ব্যুরেট ক্রোমিক এসিড দ্রবণ (গাঢ় H_2SO_4 ও $K_2Cr_2O_7$ এর দ্রবণ) ব্যবহার করা হয়। তবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা কাজ শেষ করার সাথে সাথে যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করলে সহজে পরিষ্কার হবে। পুরনো অপরিষ্কার যন্ত্রপাতিতে ময়লা শুকিয়ে গেলে বা জমে গেলে সেগুলো দূর করার জন্য যন্ত্রপাতি গরম পানিতে ফুটিয়ে নিতে হয়। কাচ সামগ্রী থেকে লুব্রিকেন্ট গ্রিজ অপসারণ কাজে সোডিয়াম কার্বনেটের লঘু দ্রবণে কাচ সামগ্রীকে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করা হয়। সিলিকন গ্রিজ দূর করতে কাচ সামগ্রীকে ডেকাহাইড্রো ন্যাফথালিনে ডুবিয়ে দুই ঘণ্টা হালকা তাপ দিতে হয়। এছাড়াও আলকাতরা জাতীয় পদার্থ, গ্রিজ, সিলিকোন তেল দূর করতে ডেকন-৯০ ডিটারজেন্ট অত্যন্ত কার্যকর। লেড সালফেট অবশেষ অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে পরিষ্কার করা হয়।

ল্যাবরেটরিতে কাজ শেষ হয়ে গেলে টেবিলটি একটি কাপড়ের ডাস্টার দ্বারা মুছে পরিষ্কার করতে হবে। ব্যবহৃত কাচের দ্রব্য যেমন– বিকার, টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্লাস্ক ইত্যাদি ব্রাশের সাহায্যে প্রথমে পানি ও পরে ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে শেষে পুনরায় পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে রাখতে হবে। শুকানোর প্রয়োজন হলে ওভেনে (40–50°C তাপমাত্রায়) রাখতে হবে। ব্যুরেট পরিষ্কারের জন্য লম্বা ব্রাশ পাওয়া যায়। এর সাহায্যে অ্যাসিটোন বা অ্যালকোহল দিয়ে পরিষ্কার (Rinse) করতে হবে এবং ব্যুরেট স্ট্যান্ডে খাড়াভাবে ক্লাম্পের সাথে আটকিয়ে রাখতে হবে। পিপেট পরিষ্কার পানি দিয়ে বার বার ধুতে হবে। প্রয়োজনে অ্যাসিটোন দিয়ে রিন্স (Rinse) করা যেতে পারে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমন– সেন্ট্রিফিউজিং মেশিন, ওয়াটার বাথ বা অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে কোনো ময়লা বা রাসায়নিক দ্রব্য পড়লে তা ডাস্টার/কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

গ্লাসসামগ্রী ব্যবহারের নিরাপদ কৌশল (Safe Use of Glass Apparatus)

রসায়ন পরীক্ষাগারে বহু ধরনের গ্লাসসামগ্রী ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে বিকার, ব্যুরেট, পিপেট, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, গোলতলি ফ্লাস্ক, পরীক্ষানল ইত্যাদি প্রধান। এগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের অন্যান্য অংশে আলোচনা করা হয়েছে। গ্লাস নির্মিত যন্ত্রপাতি অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং ভেঙে গেলে ছুরির মতো ধারালো টুকরায় পরিণত হয়। তাই ল্যাবরেটরিতে নিরাপদে গ্লাসসামগ্রী ব্যবহারের সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১. কাচের তৈরি গ্লাসসামগ্রী সব সময় পরিষ্কার রাখতে হয়।

২. গরম অবস্থায় খালি হাতে কখনো কোনো গ্লাসসামগ্রী ধরা উচিত নয়।

৩. যেদিকে পানির ট্যাপ বা বেসিন/সিঙ্ক থাকে সেদিকে কোনো গরম কাচের পাত্র রাখা ঠিক নয়। কারণ গরম কাচের পাত্রে পানি পড়লে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. ব্যুরেট বা পিপেটে কখনো তাপ দিতে হয় না। কারণ এ দুটোর সাহায্যে মাত্রিক বিশ্লেষণ করা হয়। তাপ দেওয়ার ফলে এদের আয়তনের পরিবর্তন হতে পারে।

৫. সিন্টার্ড গ্লাস ক্রুসিবল, পোর্সেলিন বেসিন, প্রয়োজনে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা পরিষ্কার করে পরবর্তীতে পরিষ্কার পানি দ্বারা ধুয়ে ওভেনে শুকানোর জন্য রাখা হয়। টেবিলের উপর রাখার সময় যেন একটার সাথে একটার ধাক্কা লেগে ভেঙে না যায় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

৬. এক স্থান হতে অন্য স্থানে নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ভেঙে না যায়।

৭. ভারী বোতল বা এসিডের বোতলের শুধু গলা না ধরে নিচে হাত দিয়ে ধরতে হয়। নচেৎ কোনো কারণে পড়ে ভেঙে গেলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৮. কাচ পাত্রে কোনো জিনিস গরম করতে গেলে প্রথমে মৃদু তাপে আস্তে আস্তে ও পরে তাপমাত্রা বাড়িয়ে উচ্চতাপে তাপ দিলে পাত্রটি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

৯. ডেসিকেটরের মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি থাকে এবং এটি অপেক্ষাকৃত ভারী হয়। যার জন্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে সাবধানে নিতে হয় এবং এর মুখে গ্রিজ লাগিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করতে হয়।

১০. এছাড়া অন্য কাচপাত্র যেমন– ফানেল, বিন্দুপাতি ফানেল, থিসল ফানেল, পাতন ফ্লাস্ক, মাপন ফ্লাস্ক ইত্যাদি খুব ঠুনকো ধরনের। এটা খুব সাবধানে ব্যবহার না করলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে।

১১. গ্লাসসামগ্রী ধোয়ার সময় পানির ট্যাপে বা বেসিনে যেন আঘাত না লাগে।

১২. টেস্টটিউব ব্যবহারের সময় হোল্ডার ব্যবহার করতে হবে। হোল্ডারে টেস্টটিউব ফিটিংকালে বেশি চাপ দেওয়া যাবে না।

১৩. কাচ সামগ্রী প্লাস্টিক বা রাবার টিউবিং ঢোকাতে হলে টিউবের প্রান্তকে গ্রিজ বা গ্লিসারিন দ্বারা পিচ্ছিল করে নিতে হবে। এছাড়া গোলতলি ফ্লাস্কের মুখের আকারের সাথে সংগতিপূর্ণ শীতক, স্টপার লাগাতে হবে এবং কাজ শেষে খুলে মুছে বা ধুয়ে রাখতে হবে। তা না হলে শীতক ফ্লাস্কের মুখে স্থায়িভাবে লেগে যেতে পারে।

১৪. স্ট্যান্ডে ব্যুরেট আটকানোর সময় আলতোভাবে ক্ল্যাম্পের সাথে এমনভাবে লাগাতে হবে যেন ব্যুরেট উঠানামা না করে।

বিকার

ফানেল

কনিক্যাল ফ্লাস্ক

মেজারিং সিলিন্ডার

সার-সংক্ষেপ

- **গ্লাস সামগ্রী পরিষ্কারকরণ :** পরীক্ষাগারে ব্যবহার উপযোগী পরিষ্কারক ব্যবহার করতে হবে। এ পরিষ্কারক ঘরে ব্যবহৃত ডিশ ওয়াশিং পরিষ্কারক অপেক্ষা উপযোগী।
- **গ্লাস সামগ্রী ব্যবহার :** উত্তপ্ত এবং শীতল কাচ দেখতে একই রকম মনে হবে। এটি নিশ্চিত হও যে, অপর প্রান্ত মসৃণ করার কাজ শুরু করার পূর্বেই এক প্রান্ত শীতল হয়ে গেছে।
- **কনিক্যাল ফ্লাক্স ব্যবহার :** টাইট্রেশন করার সময়টাইটার নেওয়ার জন্য কনিক্যাল ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয়। এগুলো ব্যুরেটের নিচে রাখা হয়। বিভিন্ন পরিমাপের কনিক্যাল ফ্লাক্স থাকে।
- **ওয়াশ বোতল ব্যবহার :** কোনো কিছুকে ধৌত করার কাজে বা চাপ প্রয়োগ করে পানি বা দ্রাবক প্রবল বেগে ছিটিয়ে নিতে ওয়াশ বোতল ব্যবহৃত হয়।
- **রিয়াজেন্ট বোতল :** রিয়াজেন্ট বোতল কাচ, প্লাস্টিক বা বোরো সিলিকেট বা এরূপ কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং বিশেষ ধরনের ঢাকনা বা স্টপারযুক্ত এবং তরল বা কঠিন রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

পাঠ-৮.৩ ঃ বালেন্স

পল-বুঙ্গি ব্যালেন্স (Paul-Bunge Balance)

মাত্রিক বিশ্লেষণের জন্য সূক্ষ্ম ও সঠিক ওজন নির্ণয় একান্ত প্রয়োজন। এজন্য এই রাসায়নিক নিক্তি (Balance) ব্যবহার করা হয়।

গঠন : একটি আয়তাকার বেদির উপর পল-বুঙ্গি ব্যালেন্স বসানো থাকে এবং নিক্তিটি একটি কাঠের ফ্রেমে আটকানো গ্লাস বক্সের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়। এই বক্সের নিচের দিকে স্পিরিট লেভেলের তিনটি লেভেলিং স্ক্রু থাকে। এই নিক্তিতে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সংকরের তৈরি দাগ কাটা একটি বিম (Beam) থাকে। এই বিমের দুই প্রান্তে দুটি সমন্বয়কারী স্ক্রু থাকে। এর সাহায্যে পাল্লায় কোনো ওজন বা পদার্থ না রেখে প্রয়োজনে স্ক্রু ঘুরিয়ে তুলাদণ্ডের নির্দেশক স্কেলের শূন্য বা রেস্ট বিন্দুতে স্থাপন করা হয়। বিমের মাঝখানে একটি এবং মধ্যস্থল হতে দুই প্রান্তের দিকে সমান দূরত্বে আরও দুটি প্রিজমাকৃতির ফলক থাকে। বিমের প্রান্তে ফলক হয়ে একটি করে মোট দুটো পাল্লা ঝুলানো থাকে। এই ফলকগুলো অ্যাগেট (agate) বা কোরান্ডাম দ্বারা তৈরি। এ কারণে এতে মরিচা পড়ে না। বিমের মাঝখানের ফলকটি একটি অ্যাগেট প্লেটটের উপর প্রতিস্থাপন করা হয়। অ্যাগেট প্লেটটটি একটি দণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। এর সাহায্যে বিমটি উঁচুনিচু করা যায়, কারণ দণ্ডটি ফাঁপা এবং এর মধ্য দিয়ে ওঠানামা করতে পারে এরূপ একটি সচল দণ্ড যুক্ত থাকে। ফাঁপা দণ্ডের গোড়ার দিকে একটি স্কেল থাকে। নিক্তির বিমের সাথে যুক্ত একটি নির্দেশক এই স্কেলের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে। স্কেলটির মাঝখানের দুই দিকে দশটি করে দাগ কাটা থাকে। প্রয়োজনে একটি হাতলের সাহায্যে অ্যাগেট প্লেটটকে ওঠানামা করানো যায়। নিক্তিটিকে একটি কাচের বাক্সের মধ্যে রাখা হয়, যাতে বাতাস দ্বারা ওজন কমবেশি না হয়। এই বাক্সের সামনের

দিকে দরজা থাকে। যেটি খুলে পাল্লায় ওজন বা যে বস্তুর ওজন নিতে হবে সেটি বসানো যায়। সাধারণত দরজা বন্ধ করে ওজন নিতে হয়। নিক্তির নিচের তলে স্পিরিট লেভেল থাকে যার সাহায্যে নিক্তিকে সমান তলে আনা যায়। বিমের যেকোনো দাগের উপর রাইডার বা আরোহী বসানোর ব্যবস্থা থাকে। আরোহী একটি সরু বাঁকানো তার। যে ধাতব দণ্ডের সাহায্যে তুলাদণ্ডের স্কেলের উপর দিয়ে রাইডারকে ডানে বা বামে চলাচল করানো হয় তাকে আরোহী বাহক বলে। আরোহী ব্যবহার করে পল-বুঙ্গি ব্যালেন্সের সাহায্যে চার দশমিক স্থান পর্যন্ত পদার্থের ভর নির্ণয় করা যায়।

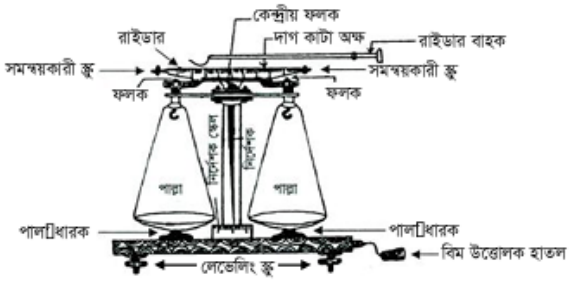

চিত্র- : পল-বুঙ্গি ব্যালেন্স

চিত্র- : ওজন বাক্স

ওজন বাক্স (Weight Box) : সঠিকভাবে ওজন নেওয়ার জন্য ওজন বাক্স ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 গ্রামের ওজন থাকে। এছাড়া 10, 20, 50, 100, 200, 500 মিলিগ্রামের ওজন- ওজন বাক্সে রক্ষিত নির্দিষ্ট স্থানে বসানো থাকে। এছাড়া 5 অথবা 10 মিলিগ্রাম ওজনের রাইডার থাকে।

রাইডার ধ্রুবক নির্ণয় : পল-বুঙ্গি ব্যালেন্সের বাম দিকের প্রান্তে 0 এবং ডান প্রান্তে 10 লেখা থাকে। এর মধ্যে সর্বমোট 100টি ভাগ থাকে। ওজন নেওয়ার সময় 10 মিলিগ্রাম রাইডারটি শূন্যে রেখে সমন্বয় স্ক্রুর সাহায্যে নির্দেশকটি স্কেলের মধ্যস্থলে আনা হয়। এরপর রাইডারটি বিমের ডান দিকে 100তম ঘরে রেখে ওজন বাম পাল্লায় নেওয়া হয়। দেখা যায় এর সমভার করার জন্য 20 মিলিগ্রাম ওজন লেগেছে।

অতএব, 100 ঘরের জন্য প্রয়োজন 20 মিলিগ্রাম = 0·02 গ্রাম

$\therefore$ 1 ঘরের জন্য প্রয়োজন $\frac{0{\cdot}020}{100}$ মিলিগ্রাম = 0·0002 গ্রাম

$\therefore$ রাইডার ধ্রুবক = 0·0002 গ্রাম

ওজন গ্রহণ : যে বস্তুর ওজন নিতে হবে সেটিকে একটি ওজন বোতলে নিয়ে নিক্তির বাম পাল্লায় রাখতে হবে। ডান পাল্লায় প্রয়োজনীয় ওজন রাখা হয় এবং দ্রব্যসহ বোতলটির ওজন নেওয়া হয়। এখন যে পরিমাণ দ্রব্য প্রয়োজন, তা অল্প অল্প করে বিকার বা আয়তনমিতিক ফ্লাস্কে নিতে হয়। পরবর্তীতে অবশিষ্ট দ্রব্যসহ বোতলের ওজন বের করা হয়। এখন প্রথম ও শেষ ওজনের পার্থক্যই বস্তুর ওজন।

ওজন মাপার পদ্ধতি : প্রথমে নিক্তিটিকে স্ক্রুর সাহায্যে লেভেল করতে হবে। এরপর রাইডার ধ্রুবক নির্ণয় করতে হবে। এরপর যে বস্তুর ওজন নিতে হবে সেটি বাম পাল্লায় রেখে ডান পাল্লায় ওজন রেখে অনড় নির্দেশকটিকে মুক্ত অবস্থায় আনতে হবে যাতে নির্দেশকটি স্কেল বরাবর উভয় দিকে দুলতে পারে এবং সমভার হওয়ার কাছাকাছি হলে রাইডার ব্যবহার করে ওজন গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে যে পরিমাণ বস্তুর ওজন নিতে হবে সেই পরিমাণ বস্তু অন্য পাত্রে ঢেলে নিয়ে পুনরায় ওজন ও রাইডার ব্যবহার করে ওজন বোতলের ওজন নিতে হবে। এই দুই ওজনের পার্থক্যই বস্তুর প্রকৃত ওজন। একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে ওজন নেওয়ার সময় যদি প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য বেশি বা কম বস্তু ওজন বোতল হতে বের করে নেওয়া হয় তবে কোনো অসুবিধা নেই। ওজনটি সঠিকভাবে নিতে হবে। ডান পাল্লায় রক্ষিত বিভিন্ন ওজন যোগ করে তার সাথে রাইডারের মান যোগ করতে হবে। নিচে একটা উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হলো।

ধরা যাক, একটি বস্তুর ওজন নিতে 50, 20, 2, 1 গ্রাম এবং 500, 100 মিলিগ্রাম ওজন ব্যবহার করা হলো এবং রাইডার 20 দাগ পর্যন্ত হলো। তাহলে নির্ণেয় ওজন হবে–

$(50 + 20 + 2 + 1)$ গ্রাম + $(500 + 100)$ মিলিগ্রাম + $(20 \times 0{\cdot}0002)$ গ্রাম

= 73 গ্রাম + 0·600 গ্রাম + 0·0040 গ্রাম

= 73·6040 গ্রাম

ডিজিটাল ব্যালেন্স (Digital Balance)

সঠিক ও সূক্ষ্ম ভর পরিমাপের জন্য রসায়ন ল্যাবরেটরিতে ডিজিটাল ব্যালেন্স ব্যবহার করা হয়। এটি একটি একক পাল্লাবিশিষ্ট (Single pan) ব্যালেন্স। ডিজিটাল ব্যালেন্স চতুষ্কোণ বা গোলাকার হতে পারে। এই ব্যালেন্সের সাহায্যে অধিকতর সহজে ও সূক্ষ্মভাবে দ্রব্য পরিমাপ করা যায়। ডিজিটাল ব্যালেন্সে বস্তুর ওজন মনিটরে বা পর্দায় অঙ্কে (Digit) ভেসে ওঠে বা দৃশ্যমান হয়। এই ব্যালেন্স অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় এর প্যানের চারদিকে কাচের দরজা দিয়ে ঢাকা থাকে। এর মধ্যে ডান, বাম ও উপরের দরজা তিনটি স্লাইড (Slide) করে খোলা যায়। ফলে প্যানের উপর বস্তু রাখা ও বের করা সহজ হয়।

দুই ধরনের ডিজিটাল ব্যালেন্স ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হয়। যথা– 2-ডিজিট ব্যালেন্স ও 4-ডিজিট ব্যালেন্স।

2-ডিজিট ব্যালেন্স : সাধারণ পরিমাপের জন্য দশমিকের পর 2-ডিজিট সংবলিত ব্যালেন্স ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ব্যালেন্সের সাহায্যে 0·1–0·001 g পর্যন্ত সূক্ষ্ম বা নির্ভুলভাবে ভর পরিমাপ করা যায়। সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের ($KMnO_4$, $H_2C_2O_4$,

KNO_3, NaOH ইত্যাদি) ভর মেপে দ্রবণ প্রস্তুতি ও সাধারণ বিকারক ($AgNO_3$ দ্রবণ, ফেহলিং দ্রবণ, টলেন বিকারক ইত্যাদি) প্রস্তুতিতে যেক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পরিমাপের প্রয়োজন হয় না সেক্ষেত্রে এ ব্যালেন্স ব্যবহৃত হয়।

কার্যপদ্ধতি : প্রথমে ব্যালেন্সটিকে পরিষ্কার ও সমতল জায়গায় বসিয়ে সামনের কাচের জানালা বা ডিসপ্লে (Display) জানালা উপরে উঠানো হয়। ব্যালেন্সের সুইচ অন করে বস্তু ধারক পাত্র (বিকার, মসৃণ কাগজ, ওজন বোতল ইত্যাদি) রেখে Tare সুইচ বা Calibarate switch চাপ দিলে ডিসপ্লেতে 0·00 দেখায়। এরপর পাত্রে প্রয়োজনমতো বস্তু নিয়ে ভর মাপা হয়।

4-ডিজিট ব্যালেন্স : যেসব ক্ষেত্রে খুব অল্প পরিমাণ রাসায়নিক উপাদান পরিমাপের ক্ষেত্রে অতি সংবেদনশীল 4-ডিজিট ব্যালেন্স ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের মাইক্রো অ্যানালিটিক্যাল ব্যালেন্সের সাহায্যে 0·0001 g বা 1·0 mg এর দশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত ভর সূক্ষ্ম বা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায়। প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ (Na_2CO_3 (শুষ্ক), $K_2Cr_2O_7$, $H_2C_2O_4{\cdot}2H_2O$ ইত্যাদি) পরিমাপ করে প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতিতে এই ব্যালেন্সে, ভর নেওয়া হয়। এই ব্যালেন্সের কার্যপদ্ধতি 2-ডিজিট ব্যালেন্সের অনুরূপ। এক্ষেত্রে ডিসপ্লে জানালা অবশ্য বন্ধ রাখতে হয়, যাতে বায়ুপ্রবাহ বা ধুলিকণা এক্ষেত্রে যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

ডিজিটাল ব্যালেন্স

ডিজিটাল ব্যালেন্স ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে– যে কেউ এ ব্যালেন্সের সাহায্যে সঠিক ও নির্ভুলভাবে ভর পরিমাপ করতে পারে। যেখানে বাতাস চলাচলে অন্য নিক্তির সাহায্যে ভর মাপলে ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে ডিজিটাল ব্যালেন্সের চারদিকে গ্লাস দ্বারা ঘেরা থাকায় এ ধরনের ত্রুটি হয় না।

সার-সংক্ষেপ

- **মাপন :** বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের জন্য পল-বুঙ্গি ব্যালেন্স, ডিজিটাল ব্যালেন্স, মেজারিং সিলিন্ডার, ব্যুরেট, আয়তনমিতিক ফ্লাস্ক ও পিপেট ব্যবহার করা হয়।
- **ব্যালেন্স :** ল্যাবরেটরিতে সাধারণত দুই ধরনের ব্যালেন্স ব্যবহার করা হয়। পল-বুঙ্গি ব্যালেন্স ও ডিজিটাল ব্যালেন্স। ডিজিটাল ব্যালেন্স ব্যবহার খুব সহজ এবং এর সংবেদনশীলতা ২ ও ৪-ডিজিট পর্যন্ত হওয়ায়এ ধরনের ব্যালেন্স ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ ধরনের সংবেদনশীল ব্যালেন্স ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- **ডিজিটাল ব্যালেন্স :** ল্যাবরেটরিতে যেকোনো রাসায়নিক উপাদানে খুব দ্রুত ওৎন পরিমাপের ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যালেন্স ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল ব্যালেন্স অত্যন্ত সুবেধী এবং এর সাহায্যে অত্যন্ত কম সময়ে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায়। এ ধরনের ব্যালেন্সের উপরে এক ধরনের পাল্লা থাকে যার উপর ওজন নেয়ার রাসায়নিক উপাদানকে তার প্রকৃতি ও ধরন অনুসারে নেয়া হয়।
- **পল-বুঙ্গি ব্যালেন্স :** ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রেই অল্প পরিমাণউপাদানের ওজন পরিমাপ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এরূপ ওজন পরিমাপ করার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম পল-বুঙ্গি রাসায়নিক ব্যালেন্স। এ ব্যালেন্সের সাহায্যে 0.0001 g ওজন পরিমাপ করা সম্ভব।
- **রাইডার ধ্রুবক :** বৈশ্লেষণিক রসায়নে রাসায়নিক নিক্তিতে একটি অতি সূক্ষ্ম ধাতব তারের বাঁকানো টুকরা থাকে যা নিক্তির

পাঠ-৮.৪ ঃ গ্লাস সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্র, বিধি ও ব্যবহারের কৌশল

মেজারিং সিলিন্ডার (Measuring Cylinder)

এটি একটি গোলাকৃতি লম্বা ফাঁপা কাচের তৈরি নল যার গায়ে 0·0 হতে 20, 25, 50, 100 ইত্যাদি মি.লি. পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে এবং নিচের দিক বন্ধ। সূক্ষ্ম মাপের প্রয়োজন না হলে এই সিলিন্ডার দিয়ে রাসায়নিক দ্রব্য বা তরল পদার্থ মেপে নেওয়া যায়। তবে আয়তন যত বেশি হয় সিলিন্ডারের আকার তত বড় হয় এবং পরিমাপের সূক্ষ্মতা তত কমে যায়। আয়তন পরিমাপের প্রয়োজন অনুযায়ী মেজারিং সিলিন্ডার নির্বাচন করা হয়। এরপর পরিষ্কার ও শুষ্ক মেজারিং সিলিন্ডারে ফানেলের সাহায্যে ধীরে ধীরে তরল পদার্থকে নির্দিষ্ট দাগ পর্যন্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তরলে অবতলের নিম্নতল ভাগ যেন সিলিন্ডারের নির্দিষ্ট দাগকে স্পর্শ করে। পরে ফানেলের সাহায্যে তরল পদার্থকে পরীক্ষা সম্পাদনের পাত্রে ঢেলে নেওয়া হয়।

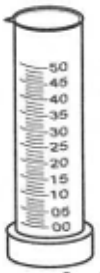

মেজারিং সিলিন্ডার

আয়তনমিতিক ফ্লাস্ক (Volumetric Flask)

লম্বা গলাবিশিষ্ট এবং চ্যাপ্টা তলবিশিষ্ট কাচের ফ্লাস্ককে আয়তনমিতিক ফ্লাস্ক বলে। আয়তনমাত্রিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ ফ্লাস্কটি ব্যবহৃত হয় তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে আয়তনমিতিক ফ্লাস্ক। 100 mL, 250 mL, 500 mL এবং 1000 mL ধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট এ ফ্লাস্কটি হয়ে থাকে। লম্বা নলের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে একটি দাগ থাকে যা এ ফ্লাস্কের আয়তনের সীমারেখা নির্দেশ করে। ফ্লাস্কটির গায়ে এর ধারণ ক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা থাকে। এর মুখটি কাচ নির্মিত একটি স্টপার দ্বারা বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকে। নির্দিষ্ট আয়তনের প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুত করতে এ ফ্লাস্কটি ব্যবহৃত হয়।

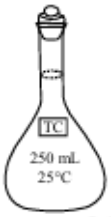

আয়তনমিতিক ফ্লাস্ক

ব্যুরেট ও ব্যুরেটের ব্যবহার কৌশল (Burette and Technique of Using Burette)

আয়তনমিতিক পদ্ধতিতে উপযুক্ত নির্দেশকের উপস্থিতিতে কোনো প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে অপর কোনো অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণের ঘনমাত্রা বা পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে অনুমাপন (Titration) বলে। এসিড-ক্ষার টাইট্রেশন প্রক্রিয়ার যে বিন্দুতে এসিড ক্ষার দ্বারা প্রশমিত হয় তাকে প্রশমন বিন্দু বা তুল্য বিন্দু বলে। তুল্য বিন্দুতে নির্দেশক তার বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিক্রিয়ার সমাপ্তি নির্দেশ করে।

টাইট্রেশন প্রক্রিয়ায় ব্যুরেট, পিপেট, কনিক্যাল ফ্লাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ব্যুরেট হচ্ছে একটি দীর্ঘ কাচনল যার নিম্নপ্রান্তে একটি ট্যাপ বা স্টপকর্ক সংযুক্ত থাকে। ট্যাপের নিচের অংশের কাচনল অপেক্ষাকৃত সরু হয়। সাধারণত এসিড-ক্ষার টাইট্রেশনে ব্যুরেট এসিড দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। কনিক্যাল ফ্লাস্কের ক্ষার নিয়ে নির্দেশকযুক্ত ব্যুরেট থেকে ড্রপ আকারে এসিডযুক্ত করতে করতে সমাপনী বিন্দুতে রং পরিবর্তন হলে বুঝতে

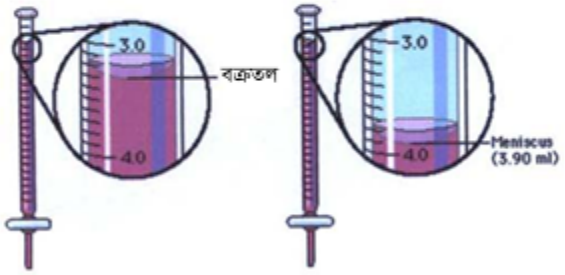

চিত্র- : ব্যুরেট

হবে টাইট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। টাইট্রেশনের সময় বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে ব্যুরেটের ট্যাপ (যা পূর্ব হতে ব্যুরেট স্ট্যান্ডে আটকানো থাকে) ধরতে হয় এবং কনিক্যাল ফ্লাস্ক ডান হাত দিয়ে ধরে ব্যুরেটের নিচে এনে আস্তে আস্তে নাড়াতে হয়, ব্যুরেট থেকে এসিড ফোঁটায় ফোঁটায় কনিক্যাল ফ্লাস্কে নিয়ে টাইট্রেশন সম্পন্ন করতে হয়। সাধারণ ব্যুরেটগুলো 0·0 mL হতে 50·00 mL পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। এভাবে তিনটি পাঠ নিতে হয়। তিনটি পাঠের মধ্যে সর্বোচ্চ পার্থক্য থাকবে 0·2 mL এর বেশি যেন না হয়। এছাড়া মাইক্রো ব্যুরেট বিভিন্ন গবেষণা কাজ ও নির্দিষ্ট পরীক্ষা কাজে ব্যবহার করা হয়। এগুলো 1·00 বা 0·05 মি.লি. হতে বিভিন্ন মাপের হয় এবং এগুলোও দাগাঙ্কিত থাকে। ব্যুরেট পাঠ নেওয়ার সময় তরলের নিম্ন অবতল যে দাগকে স্পর্শ করে সেই পাঠ নিতে হয়।

পিপেট ও পিপেটের ব্যবহার কৌশল (Pipette and Technique of Using Pipette)

পিপেট একটি দীর্ঘ কাচনল যার মাঝখানটা একটু স্ফীত। এটি সাধারণত ৫ হতে ২৫ মি.লি. পর্যন্ত মাপের হয়। এর নিচের অংশ ব্যুরেটের মতো অপেক্ষাকৃত সরু। স্ফীত অংশের উপরে ভর্তি লাইনে একটি দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা থাকে

সে স্থানে নির্দিষ্ট আয়তন অবিকল মাপা যায়। পিপেটের সাহায্যে কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা বিকারের দ্রবণ হতে মুখ দিয়ে টেনে ভর্তি লাইন পর্যন্ত নিতে হয়। এরপর হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে পিপেটের উপর মুখটি বন্ধ করতে হয়। যে ফ্লাস্কের দ্রবণকে টাইট্রেশন করতে হবে সেই ফ্লাস্কের তলদেশে পিপেটের নিচের অংশ ঠেকিয়ে উপরের বুড়ো আঙ্গুলটি সরিয়ে নিতে হয়। এভাবে পিপেট হতে সমস্ত দ্রবণ বিকারের/কনিক্যাল ফ্লাস্কের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। মুখ দিয়ে দ্রবণ টেনে তোলার সময় দ্রবণ মুখে যেতে পারে। এজন্য এসিড বা তীব্র ক্ষারীয় দ্রবণ তুলতে পিপেট ড্রপার ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দাগাঙ্কিত মাইক্রো পিপেটও পাওয়া যায় যা গবেষণা বা বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়।

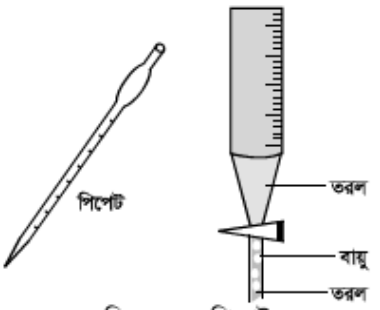

চিত্র- : পিপেট

সার-সংক্ষেপ

- **মেজারিং সিলিন্ডার :** পরিমাপক সিলিন্ডার দ্বারা সাধারণত অধিক পরিমাণের তরলের আয়তন পরিমাপণ করা হয়। বিশ্লেষণের নির্ভুলতায় আয়তনের কোনো ভূমিকা না থাকলেপরিমাপন সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়।
- **ব্যুরেট :** ব্যুরেট একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র যার সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ তরল অন্য পাত্রে সরবরাহ করা যায়।
- **পিপেট :** পিপেট ব্যবহার করা সুনির্দিষ্ট আয়তনের তরল, টাইট্রেশনবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য, পরিমাপ করা হয়। দুই ধরনের পিপেট ব্যবহার করা হয়, একটি আয়তনিক পিপেট এবং অপরটি দাগাঙ্কিত পিপেট।

পাঠ-৮.৫ ঃ স্পিরিট ল্যাম্প ব্যবহারের কৌশল

স্পিরিট ল্যাম্প (Spirit Lamp)

পরীক্ষাগারে তাপ দেওয়ার জন্য সাধারণত স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নার ব্যবহার করা হয়। স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে যথেষ্ট বা বেশি তাপ দেওয়া যায় না। এর সাহায্যে সব ধরনের কাজ করা যায় না তবে অন্য ব্যবস্থা না থাকলে এই ল্যাম্পের সাহায্যে মোটামুটিভাবে কাজ চালানো যায়। বর্তমানে অনেক উন্নত ল্যাবে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক হিটার (heater) ব্যবহার করে। তবে এ ধরনের হিটার সাধারণত গবেষণার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হয়। স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নারের সাহায্যে সরাসরি তাপ প্রয়োগ করলে পরীক্ষানল বা বিকার ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারের জালি স্থাপন করে তার উপর বিকার রেখে বা পরীক্ষানল ধরে তাপ দিলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

স্পিরিট ল্যাম্প

বুনসেন বার্নার একটি ছোট গ্যাস বার্নার যা গরম, নীল শিখা উৎপন্ন করে এবং রসায়ন পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয়। এটা একটি ফাঁপা গোলকাকৃতি ধাতুর তৈরি, যার নিচের দিকে বাতাস ঢোকার জন্য এক বা একাধিক ছিদ্র থাকে। এই বাতাস গ্যাসের সাথে মিশ্রিত হওয়ার পর একে প্রজ্বলিত করা হয়। জালি স্থাপন করে তার উপর বিকার রেখে বা পরীক্ষানল ধরে তাপ দিলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। শিখা জ্বালাবার পূর্বে উদ্বায়ী পদার্থসমূহ নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে। ইথার, বেনজিন, অ্যালকোহল সরাসরি শিখাতে উত্তপ্ত করলে আগুন ধরতে পারে। এজন্য ওয়াটার বাথ ব্যবহার করা হয়।

বুনসেন বার্নার (Bunsen Burner)

বিজ্ঞানী রবার্ট উইলহেম বুনসেনের (Robert Wilhelm Bunsen) নাম অনুসারে এই বার্নারের নামকরণ করা হয়েছে, কারণ তিনিই এই বার্নারের আবিষ্কারক। এই বার্নার প্রাকৃতিক গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম জাতীয় গ্যাস ব্যবহার করে জ্বালানো হয়।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ ল্যাবরেটরিতে এই বার্নার ব্যবহার করা হয়। এর তিনটি অংশ : ভিত্তি, বার্নার নল বা উপরের অংশ এবং বায়ু নিয়ন্ত্রক।

বুনসেন বার্নার

ভিত্তি : এটি বার্নারের নিচের অংশ। এখানে ধাতুর তৈরি একটি পার্শ্বনল যুক্ত থাকে। এই নলের সাহায্যে গ্যাস প্রবেশ করে সূক্ষ্ম জেটের মতো ছিদ্র পথে উপরে উঠে যায়। এই ভিত্তির কিছু উপরে একটি স্টপ কর্ক থাকে যার সাহায্যে নলের মধ্যে গ্যাসের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বার্নার নল বা উপরের অংশ : এ অংশটিও ধাতুর তৈরি, এখানে এক বা একাধিক বায়ু প্রবেশের ছিদ্র থাকে। ভিত্তি এবং বার্নার নলের নিচের অংশে প্যাঁচ থাকে। এই প্যাঁচের সাহায্যে ঘুরিয়ে নলটিকে ভিত্তির সাথে যুক্ত করা হয়। বায়ু প্রবেশের পথে প্রবিষ্ট বায়ুর সাথে ভিত্তির পার্শ্বনল হতে আগত গ্যাস মিশ্রিত হয়ে উপরে উঠে যায়।

এই গ্যাসে অগ্নি সংযোগ করলে নলমুখে শিখাসহ প্রজ্বলিত হয়।

বায়ু নিয়ন্ত্রক : এটা একটি এক বা একাধিক ছিদ্র যুক্ত ধাতুর তৈরি কলার যা বায়ু পথকে ঘিরে রাখে। প্রয়োজনমতো কলারটিকে ঘুরিয়ে বাতাস প্রবেশের পরিমাণ কমবেশি করা যায় (সাধারণত তিন ভাগ বাতাস ও এক ভাগ গ্যাস ব্যবহার করা হয়)। এই গ্যাস ও বাতাসের মিশ্রণ গ্যাসের চাপে নলের উপরের দিকে চলে আসে সেখানে এটাকে প্রজ্বলিত করা হয়।

বুনসেন বার্নারের শিখা (Flame of Bunsen Burner)

বার্নারের গ্যাস প্রবাহের পথ খোলা রেখে বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করে বার্নার প্রজ্বলিত করলে যে শিখা উৎপন্ন হয় তাকে উজ্জ্বল শিখা বলে। বায়ুর অক্সিজেন না থাকায় গ্যাস সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হয় না। এ শিখায় কিছু কার্বন কণা থাকে। পরীক্ষাগারে সাধারণত এই শিখা ব্যবহার করা হয় না।

পরীক্ষাগারে বুনসেন বার্নারের বায়ুপথ খোলা রেখে অক্সিজেন মিশ্রিত (বায়ু হতে প্রাপ্ত) গ্যাস ব্যবহার করে যে শিখা উৎপন্ন করা হয় তাকে অনুজ্জ্বল শিখা বলে। ফলে এ শিখায় কোনো কার্বন কণা থাকে না। এ শিখাকে জারণ শিখাও বলা হয়।

প্রবিষ্ট বায়ুর পরিমাণ কমবেশি করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের শিখা উৎপন্ন করা যায় :

(১) **উজ্জ্বল শিখা :** (ক) নিম্নস্থ উজ্জ্বল নীল অঞ্চল (খ) কেন্দ্রস্থ অনুজ্জ্বল অঞ্চল
(গ) মধ্যের অসম্পূর্ণ দহন অঞ্চল (ঘ) বহিস্থ পূর্ণ দহন অঞ্চল

(২) **অনুজ্জ্বল শিখা :** (ক) কেন্দ্রস্থ নীল অঞ্চল (খ) বহিস্থ অনুজ্জ্বল অঞ্চল
(গ) উজ্জ্বল টিপ

স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নার দ্বারা টেস্টটিউব, বিকার, গোলতলি ফ্লাস্ক, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, পোর্সেলিন বাটি তাপ দেওয়ার সময় সতর্কতার সাথে এবং কৌশল অবলম্বন করে তাপ দিতে হয়। নতুবা অসাবধানতা, অনভিজ্ঞতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য তাপ দেওয়ার সময় নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করা হয়–

(ক) কাচ পাত্রে তাপ দেওয়ার সময় পাত্রের বাইরের দিকটা যেন অবশ্যই শুষ্ক থাকে। প্রয়োজনে ঝুট কাপড় বা ব্রাশ দিয়ে পাত্রের বাইরের দিক মুছে দিতে হবে।

(খ) নিরাপত্তার জন্য বার্নার নিরাপদ দূরত্বে রেখে প্রথমে শিখার দৈর্ঘ্য ঠিক করতে হবে। অতঃপর অনুজ্জ্বল শিখা ব্যবহার করতে হবে।

(গ) টেস্টটিউবকে তাপ দেওয়ার সময় হোল্ডার দিয়ে ধরে কাত করে ধরতে হবে। টেস্টটিউবের মুখ যেন নিজের দিকে বা সহপাঠীর দিকে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

(ঘ) তাপ দেওয়ার সময় উত্তপ্ত তরল পদার্থ হঠাৎ ফেনাসহ পাত্রের বাইরে উপচে পড়ে। একে বাম্পিং বলে। বাম্পিং রোধের জন্য টেস্টটিউবে ধীরে ধীরে তাপ দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে ঝাঁকাতে হয়। বাম্পিং রোধের জন্য ফ্লাস্কের তরলে কয়েক টুকরা কাচ বা চিপস যোগ করা হয়।

(ঙ) দাহ্য তরল পদার্থ সরাসরি উন্মুক্ত শিখায় তাপ না দিয়ে পানি বাথে বা ইটখোলা বা উত্তপ্ত বালির উপরে রেখে তাপ দিতে হবে।

(চ) টেস্টটিউবের তলায় সরাসরি তাপ না দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাশে তাপ দিতে হবে।

(ছ) কনিক্যাল ফ্লাস্ক, গোলতলি ফ্লাস্ক, পোর্সেলিন বাটি, বিকার ইত্যাদিতে তাপ দেওয়ার জন্য ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপর পাত্র রেখে সুষমভাবে প্রথমে ধীরে ও উত্তপ্ত শিখায় তাপ দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ত্রিপদী স্ট্যান্ডের পরিবর্তে ওয়াটার বাথ, উত্তপ্ত বালি বা ইটখোলায় এসব পাত্র বসিয়ে উত্তপ্ত করা হয়।

সার-সংক্ষেপ

- **বার্নার :** বুনসেন বার্নার এবং টিরিল বার্নার পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয়। উভয় বার্নারেই বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি বায়ু ছিদ্র থাকে। টিরিল বার্নারের ভিত্তি মূলে গ্যাস প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও একটি বাল্ব থাকে।
- **পোর্সেলিন বাটি :** ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক দ্রব্যকে উত্তপ্ত করার কাজে একে ব্যবহার করা হয়। যেসব রাসায়নিক উপাদান দীর্ঘ সময় উত্তপ্ত অবস্থায় পাত্রে অবস্থান করবে সেসব ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করা হয়। পোর্সেলিনের বাটিতে সর্বোচ্চ 1500°C পর্যন্ত তাপ দেয়া যায়। ব্যালেন্সে রাসায়নিক দ্রব্যের ওজন নেওয়ার ক্ষেত্রে পোর্সেলিন বাটি ব্যবহার করা হয়। তবে HF এসিডকে পোর্সেলিন বাটিতে রাখা যাবে না।

- **পানি গাহ (Water Bath) :** ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে পানি গাহ ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে 100° সে. তাপমাত্রার নিচে সংঘটিত বিক্রিয়াকে পরিচালনা করার জন্য একে ব্যবহার করা হয়। পানি গাহের সাহায্যে বিক্রিয়কের তাপমাত্রাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গোলতলি ফ্লাস্ক বা কনিক্যাল ফ্লাস্কের মধ্যে বিক্রিয়কের তরল মিশ্রণ বা দ্রবণকে নিয়ে পানি গাহের মধ্যে রেখে তাপ দেওয়া হয়। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কিনা তা আর্থোমিটারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা হয়। প্রতিটি পানি গাহে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ব্যবস্থা থাকে।

পাঠ-৮.৬ ঃ রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সতর্কতা

রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সতর্কতা

(Caution in storing and using chemical reagents)

পরীক্ষাগারে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ও ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তোমরা অনেকেই জান না যে, কোনো কোনো রাসায়নিক পদার্থগুলো স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর । কিন্তু রসায়ন গবেষণাগারে গেলে তোমরা দেখবে অনেক রাসায়নিক পদার্থের বোতলের গায়ের লেবেলে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া আছে।

এ সাংকেতিক চিহ্নগুলো থেকে তোমরা জানতে পারবে কোন রাসায়নিক পদার্থটি বিস্ফোরক, কোনটি বিষাক্ত ও বিপজ্জনক, কোনটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, কোনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি।

মূলত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার দিন দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা জরুরি হয়ে পড়ে। এ সংক্রান্ত একটি সর্বজনীন নিয়ম চালুর জন্য ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিবেশ ও উন্নয়ন নামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো হচ্ছে–

১। রাসায়নিক পদার্থকে ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রার ভিত্তিতে বিভক্ত করা।

২। ঝুঁকির সতর্কতা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত তৈরি করা।

৩। ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রা বোঝাবার জন্য সর্বজনীন সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ ও ব্যবহার করা।

তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারক পদার্থ গায়ে চোখে মুখে পড়লে পুড়ে যায়। তাই এদের বোতলের গায়ে বিপজ্জনক সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এরকম বিস্ফোরক পদার্থ, জারক পদার্থ, দাহ্য পদার্থ, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি পাত্রের গায়ে লেবেল লাগিয়ে প্রয়োজনীয় সাংকেতিক চিহ্ন প্রদান করা আবশ্যক। তাহলে ছাত্রছাত্রী বা ব্যবহারকারী সহজেই কোনো রাসায়নিক পদার্থের পাত্রের গায়ের লেবেল দেখে ঝুঁকির মাত্রা মাথায় রেখে সাবধানতার সাথে পদার্থ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারবে। কোন রাসায়নিক পদার্থ কোথায় কীভাবে সংরক্ষণ করলে রাসায়নিক দ্রব্যের মান ঠিক থাকবে ও অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে সেসব ধারণা পাবে। এছাড়া কোন রাসায়নিক পদার্থটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, কোন পদার্থটি নিয়ে কাজ করতে স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে, কোনটি দাহ্য পদার্থ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

নিচে কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের সাংকেতিক চিহ্ন ও ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা ছক আকারে দেওয়া হলো :

সাংকেতিক চিহ্ন	ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রা	সাবধানতা
বিপজ্জনক	এই সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য মারাত্মক বিষাক্ত যা নিঃশ্বাসে বা ত্বকের মাধ্যমে ভিতরে গেলে মারাত্মক বিষক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। এমনকি খেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। যেমন– সায়ানাইড, অ্যানিলিন, CCl_4, R – X, ক্লোরোফর্ম ($CHCl_3$) ।	এ ধরনের পদার্থ অবশ্যই তালাবদ্ধ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যবহারের সময় গ্লাভস, চশমা, মাস্ক, অ্যাপ্রন ব্যবহার করতে হবে। পরীক্ষার পর পরীক্ষণ মিশ্রণ যথাযথ পরিশোধন করতে হবে।
বিস্ফোরক	চিহ্নটি দ্বারা বিস্ফোরক দ্রব্য বোঝায়। এ চিহ্নযুক্ত যৌগগুলো অস্থিত এবং নিজে নিজেই বিক্রিয়া করতে পারে। যেমন– জৈব পার অক্সাইড, অ্যাসিটালাইড, অ্যাজাইড, নাইট্রোসো ও নাইট্রো যৌগ, ওজোনাইড।	এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যেন স্থির থাকে। সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। অন্য কোনো পদার্থের সাথে ধীরে ধীরে যুক্ত করতে হবে।
তেজস্ক্রিয়	এটি দ্বারা ক্ষতিকর আলোকরশ্মি চিহ্নিত করা হয়। এসব রশ্মির প্রভাবে দেহের বিকলাঙ্গতা, ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন– তেজস্ক্রিয় ধাতুসমূহ যেগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকর।	রশ্মি বের হতে পারে না এমন পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যবহারের সময় বিশেষ গ্লাভস, অ্যাপ্রন ও মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
জারক	জারক ও সংবেদনশীল পদার্থ বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। নিঃশ্বাসে গেলে শ্বাসকষ্ট, ত্বকে লাগলে ক্ষত হতে পারে। যেমন– ক্লোরিন গ্যাস, H_2O_2, ক্রোমিক এসিড, পারক্লোরিক এসিড, ফেরিক ক্লোরাইড, আয়োডিন, ব্রোমিন।	জারণ বিক্রিয়া করতে পারে না এমন পাত্রে রাখতে হবে। গ্লাভস, চশমা, মাস্ক, অ্যাপ্রন ইত্যাদি ব্যবহারের সময় পরিধান করতে হবে।
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর	এই সংকেতিক চিহ্নযুক্ত পদার্থ জলজ জীব ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। যেমন– মার্কারি, সায়ানাইড, ক্লোরিন, ফ্লোরিন, HCl, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন যৌগ, ডিডিটি ইত্যাদি।	এ ধরনের পদার্থ নদীনালার পানিতে যেন মিশতে না পারে সেজন্য পরীক্ষণ মিশ্রণ পরিশোধন করে নিরাপদ স্থানে ফেলতে হবে।

দাহ্য পদার্থ	এই চিহ্নযুক্ত পদার্থে সহজেই আগুন ধরতে পারে। এমনকি বাতাসের জলীয় বাষ্প, অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ায় আগুন ধরতে পারে। যেমন– সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতু, ফসফরাস, অ্যারোসল, বেনজিন, ইথানল, ইথার, অ্যাসিটোন, টলুইন, লিথিয়াম, NaH, $LiAlH_4$ ইত্যাদি।	সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস কেরোসিনের নিচে অথবা বায়ুশূন্য পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। আগুন ও তাপ থেকে দূরে রাখতে হবে। দাহ্য পদার্থ মেঝেতে সংরক্ষণ করা যাবে না।
ক্ষয়কারক	এই চিহ্নযুক্ত পদার্থগুলো অত্যন্ত ক্ষয়কারক। হাত বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ত্বকে লাগলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যেমন– তীব্র এসিড ও ক্ষারক। এদের মধ্যে গাঢ় H_2SO_4, HNO_3, $H_2Cr_2O_7$, HF, NaOH, KOH ইত্যাদি।	কাচের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যবহারের সময় গ্লাভস অ্যাপ্রন ব্যবহার করতে হবে।
স্পর্শ নিষিদ্ধ	বিষাক্ত, ক্ষয়কারী পদার্থসমূহ যেগুলো কোনোভাবেই হাত দিয়ে ধরা যাবে না তাদের ক্ষেত্রে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন– পারদ, ক্যাডমিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লেড ধাতু ইত্যাদি হাত দিয়ে ধরলে পুড়ে যেতে পারে বা শরীরে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।	এই পদার্থগুলোর কাজের ক্ষেত্রে ফরসেভ, চামচ, ছুরি ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহৃত বস্তু নিরাপদ স্থানে যথাযথ পরিশোধনের পর ফেলতে হবে।

কোনো রাসায়নিক পদার্থের পাত্রের লেবেল বা আলাদাভাবে সরবরাহকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ তথ্য শিট (Material Safty Data Sheet-MSDS) এর নির্দেশনা অনুযায়ী ঐ রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ করতে হবে। MSDS এ রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ক্ষেত্র, ব্যবহার বিধি বা প্রক্রিয়া, ব্যবহার নিষেধ ইত্যাদি তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য দেওয়া থাকে। এছাড়া রাসায়নিক দ্রব্যের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি, সংরক্ষণ সতর্কতা, দাহ্যতা, তেজস্ক্রিয়তা, সক্রিয়তা ইত্যাদি তথ্য দেওয়া থাকে।

গবেষণাগারে সংরক্ষণের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যের বোতল বা পাত্রের গায়ে অনেক ক্ষেত্রে নিউমেরিক (numeric) কোড ও কালার (Colour) কোড ব্যবহার করা হয়। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

বিশেষ সতর্কতা : OX দ্বারা জারক পদার্থ, W দ্বারা বাতাসের জলীয় বাষ্প বা পানির সংস্পর্শে ক্ষতিকর হতে পারে ও X দ্বারা অন্য পদার্থের সংস্পর্শে ক্ষতিকর নির্দেশ করা হয়।

স্বাস্থ্যঝুঁকির মাত্রা ও ঝুঁকি

ঝুঁকির মাত্রা	ঝুঁকি
0	সাধারণ দহনযোগ্য পদার্থ। ক্ষতিকর দিক নেই।
1	আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা না দিলে জ্বালা করতে পারে বা সামান্য (minor) ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে।
2	উন্নত চিকিৎসা না নিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।
3	উন্নত চিকিৎসা নিলে ও আক্রান্ত হওয়ার পর মারাত্মক অস্থায়ী বা স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।
4	আক্রান্ত হলে মৃত্যু হতে পারে অথবা উন্নত চিকিৎসার পরও মারাত্মক স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে।

রাসায়নিক দ্রব্যের দহনে (burning) ঝুঁকির মাত্রা ও ঝুঁকি :

ঝুঁকির মাত্রা	ঝুঁকি
0	দহনযোগ্য নয়। ঝুঁকি নেই।
1	প্রজ্বলনের (Ignition) পূর্বে সামান্য তাপ দিয়ে নিলে দহনে ঝুঁকি নেই।
2	প্রজ্বলনের পূর্বে উচ্চ অ্যামবিয়েন্ট (Ambient) তাপমাত্রায় অবশ্যই উত্তপ্ত করে নিতে হবে।
3	যেকোনো অ্যামবিয়েন্ট তাপমাত্রা শর্তে প্রজ্বলিত করা যেতে পারে। দহনের সময় সাবধানতা অবলম্বন না করলে সামান্য ঝুঁকি থাকে।
4	সাধারণ তাপমাত্রায় এবং চাপে রাসায়নিক দ্রব্য দ্রুত এবং সম্পূর্ণরূপে বাষ্পে পরিণত হতে পারে। এ ধরনের পদার্থ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার সময় আগুন লাগতে পারে। এজন্য সাবধানে দহন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত কালার কোড :

লাল (Red, R) : দহনযোগ্য পদার্থ, এজন্য তাপ ও আগুন থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে।

নীল (Blue, B) : স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। শ্বাসের সাথে গ্রহণে, ত্বক দ্বারা শোষিত হলে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

হলুদ (Yellow, Y) : সক্রিয় (Reactive) এবং জারক পদার্থ। বায়ু, পানি ও অন্যান্য পদার্থের সাথে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করতে পারে। দহনযোগ্য ও শিখা উৎপন্নকারী পদার্থ থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে।

সাদা (White, W) : ক্ষয়কারী পদার্থ, ত্বক, চোখ ও মিউকাস পর্দার জন্য ক্ষতিকর। লাল, হলুদ ও নীল রঙের কোডকৃত দ্রব্য থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে।

ধূসর (Gray, G) : মধ্যম ক্ষতিকর পদার্থ, সাধারণ রাসায়নিক দ্রব্য হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়।

কালার কোড

ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণে কতকগুলো সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয়। যেমন–

(i) রাসায়নিক দ্রব্য কখনো খোলা অবস্থায় রাখা যাবে না। বিকারক বোতলে বিকারক রেখে ছিপি বা কর্ক লাগিয়ে রাখতে হবে।

(ii) এসিড ও ক্ষার সর্বদা ভিন্ন টেবিলে সাজিয়ে রাখতে হবে। ধূমায়িত বা গাঢ় এসিড ভিন্ন টেবিলে সাজিয়ে রাখতে হবে।

(iii) একইভাবে জারক ও বিজারক পদার্থ একই টেবিলে বা তাকে রাখা যাবে না।

(iv) পরীক্ষার জন্য বিকারক ভিন্ন টেবিলে বর্ণের ক্রমানুসারে সাজিয়ে রাখতে হবে।

(v) বিকারক বোতলে স্থায়িভাবে রাসায়নিক পদার্থের নাম, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও সতর্ক সংকেত যুক্ত লেবেল বা MSDS লাগাতে হবে। বৃহদাকারের পাত্রগুলো শেলফের নিচে রাখতে হবে।

(vi) দাহ্য পদার্থগুলো পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(vii) উচ্চ বিষাক্ত পদার্থ, গাঢ় তীব্র এসিড ও ক্ষার তালাবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

(viii) আলোক সংবেদনশীল পদার্থকে রঙিন বোতলে রাখতে হবে।

(ix) ব্যবহার মাত্রা ও পরিমাণের উপর ভিত্তি করে অধিক ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারিক ডেস্কের তাকে সাজিয়ে রাখতে হবে। রাসায়নিক উপাদানকে বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইংরেজি আদ্যক্ষরের ক্রমানুসারে সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয় নয়। এতে পরস্পর বিপরীতধর্মী পদার্থগুলো পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে।

(x) রাসায়নিক পদার্থের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রেকর্ড খাতায় স্টোররূপে সংরক্ষিত পদার্থের পরিমাণ, আয়ুষ্কাল, উৎপাদন তারিখ, প্রথম প্যাকেট/কর্ক খুলে ব্যবহারের তারিখ, সংরক্ষণের তারিখ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

- **রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ :** ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের একটি সর্বজনস্বীকৃত নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ করলে ল্যাবরেটরিতে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়ানো হয়। রাসায়নিক উপাদানের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রেকর্ড খাতা অনুসরণ করে চলতে হবে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে স্টোর রুম ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি রাসায়নিক উপাদান সংরক্ষণের পূর্বে তার বিপদের মাত্রা কত সে সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকা প্রয়োজন।
- **ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ অপসারণ :** ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা সৃষ্ট বর্জ্যের সুষ্ঠ অপসারণ একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করা আবশ্যক।
- **রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতা :** রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে প্রচলিত নিয়মসমূহ যথাযথভাবে পালন করলে ল্যাবরেটরিতে যে কোনো দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়ানো যায়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম রাসায়নিক দ্রব্যের প্রকৃতি যেমন– ক্ষয়কারক, তীব্র জারক, বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান, বিস্ফোরক

পাঠ-৮.৭ ঃ পরিবেশের উপর ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব ও পরিমিত ব্যবহারের গুরুত্ব

রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো অনুসরণ

(i) রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে কাজ করার সময় নির্দেশনা অনুযায়ী রাসায়নিক দ্রব্য নিতে হবে বা যুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি নিলে বিক্রিয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হবে, বিকারকের অপচয় হবে ও অতিরিক্ত বর্জ্য সৃষ্টি হবে। আবার প্রয়োজনের তুলনায় কম নিলে বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে না।

(ii) পরীক্ষাগারে ব্যবহারের জন্য ক্লাস শুরুর আগে শিক্ষক বা গবেষণাগারের পরিচালক মূল বোতল হতে রাসায়নিক দ্রব্য বিকারে বা কোনো পাত্রে ঢেলে দেবে।

(iii) কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের পূর্বে তার MSDS থেকে ঐ পদার্থের উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ, ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রা, হ্যাজার্ড চিহ্ন ইত্যাদি ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনে শ্রেণিশিক্ষক রাসায়নিক পদার্থের ঝুঁকি সম্পর্কে ব্রিফিং দেবেন।

(iv) প্রতিটি রাসায়নিক উপাদান সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। কোনো রাসায়নিক পদার্থ হাত দিয়ে স্পর্শ করা, স্বাদ গ্রহণ বা গন্ধ নেওয়া যাবে না।

(v) কোনো নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থের জন্য আগে থেকে নির্দিষ্ট করা স্পেচুলা/পিপেট/ড্রপার/ গ্লাসরড ব্যবহার করতে হবে। এক বিকারকে ব্যবহৃত স্পেচুলা/ পিপেট/ ড্রপার /গ্লাসরড অন্য বিকারকে ব্যবহার করা যাবে না।

(vi) যখনই কোনো রাসায়নিক দ্রব্য বোতল বা পাত্র থেকে ব্যবহার করবে তার পর পরই ছিপি বা কর্ক দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

(vii) ব্যবহারের পূর্বে সঠিক রাসায়নিক দ্রব্য, দ্রব্যের সঠিক মান ও ঘনমাত্রা নিশ্চিত হয়ে ব্যবহার করবে।

(viii) ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ ও উৎপাদিত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব, ঝুঁকির মাত্রা, ঝুঁকি, সতর্ক সংকেত ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ix) স্টক বোতল থেকে ঢেলে নেওয়ার পর অতিরিক্ত অব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ পুনরায় স্টক বোতলে রাখা যাবে না।

(x) বিষাক্ত, রাসায়নিকভাবে সক্রিয়, অনিরাপদ, বিস্ফোরণ বা হঠাৎ নির্গত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে, আগুন ধরতে পারে, পরিবেশ ও প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে এরকম রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে।

ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণ ও পরিত্যাগ

(Safe storage and disposal of chemicals used in laboratory)

ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় যেমন দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তেমনি কাজ শেষ করার পর ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য বা বর্জ্যের সংরক্ষণ ও পরিত্যাগে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নতুবা বিষাক্ত বর্জ্য সরাসরি পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালিতে ছেড়ে দিলে পরিবেশ ও প্রাণীর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে। এজন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ ও বর্জ্যের ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে বর্জ্যের শ্রেণিকরণ, সংরক্ষণ, বিশোধন, দ্রাবক পুনরুদ্ধার ও নিরাপদ পরিত্যাগের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়

অবলম্বন করতে হবে।

ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. উৎপন্ন বর্জ্যকে পুনরুদ্ধারযোগ্য বর্জ্য, ক্ষতিকর বর্জ্য, সাধারণ বর্জ্য, প্রশমনযোগ্য বর্জ্য ইত্যাদি শ্রেণিকরণ করে বিভিন্ন পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। পাত্রের গায়ে প্রয়োজনে ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা, সতর্ক চিহ্ন, সংরক্ষণের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করে MSDS লাগিয়ে দিতে হবে।

২. পুনরুদ্ধারযোগ্য বর্জ্যের জৈব দ্রাবক ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ পুনরুদ্ধার করে পরে সৃষ্ট বর্জ্যকে পরিত্যাগের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. ব্যুরেটের অব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ (যেমন– NaOH, Na_2CO_3, $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, HCl ইত্যাদি) পুনরায় ব্যবহারের জন্য বিকারে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. পরস্পর বিপরীতধর্মী বর্জ্য পৃথক পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। জারক পদার্থের সাথে কখনো দাহ্য তরল মিশ্রিত করা যাবে না। কারণ এতে আগুন ধরে যেতে পারে। কোনো অবস্থাই একই পাত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু মিশ্রিত করে সংরক্ষণ করা যাবে না। এতে পরিত্যাগযোগ্য বিভিন্ন বস্তুর বিক্রিয়ায় বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন বা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

৫. Na, K, Li ইত্যাদি সক্রিয় ধাতু বর্জ্য হিসেবে উৎপন্ন হলে এসব বর্জ্য অ্যালকোহল যোগে সংরক্ষণ পাত্রে রাখতে হবে। বর্জ্য পাত্রগুলোকে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

রাসায়নিক বর্জ্য পরিত্যাগের প্রক্রিয়া জটিল, ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময় যেন কম পরিমাণে বর্জ্য সৃষ্টি হয় তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। রাসায়নিক বর্জ্য পরিত্যাগের জন্য নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন।

১. সাধারণ নিরাপদ ও কম ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্যকে দ্রুততম সময়ে পরিত্যাগ করতে হবে। এছাড়া সাধারণ তরল বর্জ্যকে পর্যাপ্ত পানি দিয়ে ধুয়ে সিংকে পরিত্যাগ করতে হবে।

২. এসিডীয় বর্জ্যকে Na_2CO_3 বা চুন দ্বারা প্রশমিত করে এবং ক্ষারীয় বর্জ্যকে $NaHSO_4$ দ্বারা প্রশমিত করে সিংকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহে পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. পুনরুদ্ধারযোগ্য বর্জ্যের জৈব দ্রাবক পাতন প্রক্রিয়ায় পুনরুদ্ধার করে বর্জ্য পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যান্য পুনরুদ্ধারযোগ্য রাসায়নিক পদার্থ পুনরুদ্ধারের পর বর্জ্য পরিত্যাগের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বিষাক্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য ভূগর্ভস্থ বা ভূপৃষ্ঠের পানির উৎসে বা ফসলি জমিতে পরিত্যাগ করা যাবে না। প্রয়োজনে আলাদা গর্ত করে মাটি দিয়ে পলিথিনে ভরে বর্জ্যকে ঢেকে দিতে হবে।

৫. ধারক পাত্র পরিত্যাগের পূর্বে কয়েকবার ধুয়ে নিতে হবে।

৬. Li, Na, K ইত্যাদি সক্রিয় ধাতু অ্যালকোহলে (মিথানল বা ইথানল) বিক্রিয়া ঘটিয়ে নষ্ট করে পরিত্যাগ করা হয়। বিষাক্ত ধাতুর জলীয় দ্রবণ সোডিয়াম সালফাইড যোগে অধঃক্ষিপ্ত করে, H_2O_2 কে অম্লীয় $FeSO_4$ যোগে, $LiAlH_4$ কে ধ্বংস করতে Na_2SO_4 বা $MgSO_4$ ব্যবহার করা হয়। SO_2, CO_2, NO_2 গ্যাসকে চুনের পানিতে শোষণ করে প্রশমিত করা হয়। অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থকে ক্ষতিকর নয় এমন পদার্থে রূপান্তরিত করে পরিত্যাগ করা হয়।

পাঠ-৮.৮ ঃ ল্যাবরেটরি নিরাপত্তা সামগ্রী ও ব্যবহার বিধি

ল্যাবরেটরিতে কাজ করবার সময় বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন– কাপড়ে বা শরীরে এসিড লাগা, মুখমণ্ডলে বা চোখে এসিড পড়তে পারে, আগুনে পুড়ে যাওয়া, কাচের পাত্র ভেঙে কেটে যাওয়া, পরীক্ষানলে তাপ দেওয়ার সময় জাম্প করে রাসায়নিক দ্রব্য গায়ে বা চোখে মুখে পড়া, গবেষণাগারে আগুন লেগে যাওয়া ইত্যাদি। এ জাতীয় দুর্ঘটনা ঘটলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নিতে হবে :

(১) প্রথমত এসিড বা ক্ষার পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। চোখে মুখে পড়লে প্রচুর পানি দিয়ে ধুতে হবে।

(২) কোনো স্থান কেটে গেলে সেই অংশ পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকনা তুলা বা কাপড় দিয়ে মুছে এন্টিসেপটিক জাতীয় কিছু লাগাতে হবে। প্রয়োজনে ব্যান্ড এইড লাগানো যেতে পারে।

(৩) ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত গ্যাসের ধোঁয়ায় (যেমন– HCl, H_2S ইত্যাদি) শ্বাসকষ্ট বা অস্বস্তি বোধ করলে উন্মুক্ত স্থানে আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিয়ে আসতে হবে অথবা ফ্যানের বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) কোনো কারণে এসিড বা ক্ষার মুখের মধ্য দিয়ে পেটে গেলে প্রচুর পানি পান করাতে হবে। লেবুর রসও পান করানো যায়।

(৫) কেবল এসিড পেটে গেলে $MgCO_3$ চুনের পানির সাথে মিশ্রিত করে পান করালে আক্রান্ত ব্যক্তি কিছুটা স্বস্তি বোধ করবে।

উল্লিখিত কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষককে জানাতে হবে এবং এর পর পরই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

(৬) পরীক্ষাগারে আগুন লেগে গেলে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং এ যন্ত্র ল্যাবরেটরির মধ্যে দেয়ালে বা ল্যাবরেটরির বাইরের দেয়ালে রক্ষিত রাখতে হবে। এ ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষক, গবেষণাগার পরিচালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা পূর্বেই করতে হবে। আগুন বেশি হলে দমকল বাহিনীকে খবর দিতে হবে।

(৭) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কয়েক ধরনের রাখা উচিত। যেমন–

(ক) জ্বলনশীল ধাতুর (Mg, Ti, Na, Li, K) মাধ্যমে আগুন লাগলে।

(খ) জ্বলনশীল তরল, তেল, পেইন্ট বা থিনার ইত্যাদিতে আগুন লাগলে।

(গ) জ্বলনশীল কাঠ, কাপড়, কাগজ, রবার, প্লাস্টিক ইত্যাদিতে আগুন লাগলে।

এছাড়া ত্বক বা দেহকে আগুন হতে বাঁচানোর জন্য ফায়ার কম্বলও ব্যবহার করা যেতে পারে।

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

প্রাথমিক চিকিৎসা ও ফার্স্ট এইড ব· ব্যবহার বিধি (First Aid and Use of First Aid Box)

পরীক্ষাগারে ব্যবহারিক ক্লাস করার সময় ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। ল্যাবরেটরিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য এবং বিভিন্ন কাচের যন্ত্রপাতি হতে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এসব দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার আগেই ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের জন্য তাৎক্ষণিক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

ল্যাবরেটরির জন্য ফার্স্ট এইড বক্সে (প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলো থাকা আবশ্যকীয় :

(১) শুকনা তুলা ও ব্যান্ডেজ, কিছু ব্যান্ড এইড, ক্রসটেপ।
(২) এন্টিসেপটিক জাতীয়, যেমন– স্যাভলন বা ডেটল, টিংচার আয়োডিন।
(৩) দুই তিন ধরনের ফোরসেফ।
(৪) ক্ষত পরিষ্কার করার জন্য অ্যালকোহল বা এ জাতীয় অন্য কোনো পরিষ্কারক।
(৫) ছোট কাঁচি এবং চাকু।
(৬) ইনহেলার (inhaler)।
(৭) ব্যথা ও জ্বর উপশম জাতীয় ঔষধ, যেমন– প্যারাসিটামল, এসপিরিন ইত্যাদি।
(৮) পোভিডোন–আয়োডিন দ্রবণ (Povidone iodine Solution)।
(৯) অ্যান্টিবায়োটিক পাউডার বা ক্রিম, যেমন– নেবানল পাউডার বা ক্রিম।
(১০) বার্নল (Burnol), বোরিক এসিড, ভেসলিন ইত্যাদি।

ফার্স্ট এইড বক্স

ব্যবহার বিধি

১) কাচে বা অন্য কিছুতে হাত বা পা কেটে গেলে ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার পানি বা অ্যালকোহল দিয়ে পরিষ্কার করে শুকনা কাপড় দিয়ে মুছে ব্যান্ড এইড লাগানো যায় অথবা স্যাভলন দিয়ে ব্যান্ডেজ করে রাখতে হবে। ক্ষত বেশি হলে অ্যান্টিবায়োটিক পাউডার বা ক্রিম দিয়ে ব্যান্ডেজ করতে হবে।

২) ক্ষতস্থানে কাচের টুকরা ঢুকে গেলে তা ফোরসেফ দিয়ে বের করে এনে পরিষ্কার করে মুছে অ্যান্টিবায়োটিক পাউডার বা ক্রিম লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করতে হবে।

৩) কোনো স্থান পুড়ে গেলে অ্যালকোহল দিয়ে পরিষ্কার করে পিকরিক এসিড দ্রবণ ব্যবহার করা যায় অথবা বার্নল লাগানো যায়। বর্তমানে গরম পানিতে পুড়ে গেলে প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধৌত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

৪) সামান্য কেটে গেলে হেক্সাসোল বা পোভিডোন-আয়োডিন দ্রবণের সাহায্যে পরিষ্কার করে ব্যান্ড এইড লাগিয়ে দেওয়া যায়।

সার-সংক্ষেপ

- **ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণ ও পরিত্যাগ :** শুধুমাত্রা বিশুদ্ধপানিই সিঙ্কের মাধ্যমে অপসারিত হতে পারে। অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থই সিঙ্কের মাধ্যমে ফেলা যাবে না। বর্জ্য অপসারণের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। কোনো রাসায়নিক বর্জ্য সিঙ্কের মাধ্যমে বা সাধারণ আবর্জনার সাথে ফেলা যাবে না।
- **ল্যাবরেটরির নিরাপত্তা সামগ্রী :** রসায়ন ল্যাবরেটরিতে সকলের ব্যবহারের জন্য কতিপয় নিরাপত্তা সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকে। এসব নিরাপত্তা সামগ্রীর মধ্যে ফিউম হুড, অগ্নি নির্বাপক, নিরাপত্তা জলাধার, চোখ ধৌতকরণ ট্যাপ, অগ্নি কম্বল, প্রথম সহায়ক বক্স, গ্যাস-বন্ধকরণ ভাল্ব, জরুরি টেলিফোন ব্যবস্থা অন্যতম।